গণসংগীত ঃ আবদুল লতিফ ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

আ সা দু ল হ ক

আব্দুল লতিফ ‘নেই’। এই নেইটা ছোট একটি কথা। কিন্তু এর অনেক তাৎপর্য, অনেক ঝাঁঝ। মেনে নেয়াটা কঠিন। আব্দুল লতিফকে গণসংগীত শিল্পী না বলে গণশিল্পী বললে অত্যুক্তি হয় না। কেননা গণসংগীত করতে করতে কখন যে তিনি গণজনের মনের মণিকোঠার নিভৃত কোণে ভালোবাসার স্থান গড়ে নিয়েছিলেন তা এতদিন অজানাই ছিল। আজ আব্দুল লতিফ নেই। সংস্কৃতিপ্রেমী হাজার হাজার মানুষের ব্যথাতুর হৃদয়, মলিন মুখ সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে লতিফ ভাই কত আপনজন ছিলেন আমাদের।

গণসঙ্গীত শিল্পী আব্দুল লতিফ বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি একাধারে বাংলা ভাষার গানের এক সাহসী ভাষা সৈনিক, পল্লীগানের এক মরমী শিল্পী এমন কি আধুনিক গান রচণাতেও ভালোবাসা ও সোহাগের পরশ বুলিয়ে শত শত প্রেমিক-প্রেমিকার মনে আনন্দের দোলা দিয়েছেন। শুধু কি তাই, ইসলামী গানেও হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের হৃদয়ে আল্লা-রসুল ও পরকালের কথা এমনই সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন যে, এ গান শুনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মানুষ আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রবেশ করে সৃষ্টির অপার রহস্যের সন্ধানে মত্ত হয়। তার রচিত গান গত চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল থেকে আমাদের মনে রেখাপাত করে আছে। তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হাজার দৃষ্টান্তের সমান হবে। কেননা, বাংলার ধর্মপ্রাণ খেটে খাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ানুভূতিকে জাগ্রত করে লতিফ ভাইয়ের “দুয়ারে আইসাছে পালকি নায়রী গাও তোলরে বলো মুখে আল্লা রসুল সবে বলো” লক্ষ কোটি মানুষের জন্য রচিত সুরের সেই পালকি চড়েই তিনি আজ পরলোকে পাড়ি জমালেন।

আমরা জানি, শিল্প ও সংস্কৃতি হলো একটি জাতির সার্বিক দর্পণ। যে দর্পণে প্রতিফলিত হয় গণমানুষের চিন্তা-চেতনা তথা তাদের জীবনের মূল্যবোধ আর সে মূল্যবোধের অর্থই হচ্ছে সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের সাধনা। ফুলগাছের একটি কলি বিকশিত না হলে যেমন তাকে পরিপূর্ণ ফুল বলা যায় না, ঠিক তেমনি জাতীয় সংস্কৃতির আংশিক প্রতিচ্ছবিও পরিপূর্ণভাবে একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে গণ্য হয়না। বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতিকে আব্দুল লতিফ এমনভাবেই হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন যে, বাঙালিত্বের বাইরে তাকে আর ভাবা যায় না। বাঙালির সংগ্রামী জীবনের ঐতিহ্য হাজার বছরের। রক্ত দিয়ে, ঘাম দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে গড়ে তোলা এ সভ্যতার পরতে পরতে রয়েছে যেমন ত্যাগের মহান গাঁথা, তেমনি বীরত্বের ঐশ্বর্যময় কাহিনী। আব্দুল লতিফ সেই বীর সেনানীর একজন।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শনিবার সকাল নয়টায় দেশের বরেণ্য গণসংগীত শিল্পী, গীতিকার, ভাষা সৈনিক আব্দুল লতিফ অমর সুরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। আব্দুল লতিফের কনিষ্ঠ পুত্রবধূর (আরিফের স্ত্রী) ভাষ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে যখন দুধ আর কর্ণফ্লেক্স খাওয়াচ্ছিল তখন তিনবার নেবার পরে আর খেতে রাজি হননি। কিন্তু পুত্রবধূ অনেক অনুনয় করার পরে চোখ খুলে তার দিকে তাকিয়ে হাতের তর্জনীটা আস্তে আস্তে তুলে তার ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, ‘চুপ’। এটিই ছিল এই গুণী শিল্পীর শেষ উচ্চারিত শব্দ। শনিবার সকালে মৃত্যুর আগে তিনি ইংগিত করেন চায়ের জন্য এবং দু’বার দু’কাপ চা পান করেন। তার পরে তার শ্বাসকস্ট শুরু হয়, অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের লোকজন দ্রুত সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যান এবং কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এই হলো আব্দুল লতিফের মৃত্যু সংক্রান্ত ছোট্ট গল্প। গল্পটা ছোট হলেও তাঁর কর্মমুখর বর্ণাঢ্য জীবন আমাদের অনেক জানার, বোঝার এবং গবেষণার বিষয় হয়ে রইল। জীবদ্দশায় এই জিনিয়াসকে আমরা তেমন জানার এবং বোঝার বিষয় হিসেবে ভাবিনি, কিন্তু আজ তিনি নেই, জাতির প্রতিটি আন্দোলন, অর্জন, আর গৌরবে তিনি যে কতটা জড়িয়ে আছেন তা তাঁর শূন্যতাই প্রমাণ করবে। আমার মনে হয় না এ শূন্যস্থান সহজে পুরণীয় ক্ষতি বলে জাতি মেনে নিতে পারবে। সংস্কৃতিতে নিবেদিত অফুরান প্রাণ লতিফ ভাই কখনোই দেশ এবং দেশের মানুষের প্রাণের দাবির বাইরে কোন বিষয় থাকতে পারে তা ভাবতেই পারতেন না। পাকিস্তান সরকারের হুলিয়া মাথায় করেও লেখা আর সুরের মাঝে তিনি ভাষা আন্দোলনের গান করেছেন, মানুষকে সংঘবদ্ধ ও সচেতন করেছেন। তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান বিরোধী একটা কথা বলা যে কতটা বিপদের তা ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই। কতটা সাহস আর দেশপ্রেমী হলে এমনটি করা যায় সে কথাই আজ বিবেচ্য । ভাষা আন্দোলনের প্রথম গানে কন্ঠ দিয়েছিলেন আব্দুল লতিফ এবং অসাধারণ একটি গান রচনাও করেছিলেন। সর্বশেষ বাঙালির জীবন-মরণ মুক্তিযুদ্ধে তার কন্ঠ ছিল দৃপ্ত উচ্চারণে সাহসী।

লতিফ ভাইকে নিয়ে বলতে গেলে কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা বলব সেই বিষয় নির্বাচনই কঠিন। খুব কাছাকাছি সময়ের একটি কথা না বললেই নয়- বরিশালের কৃতী সন্তানদের সম্বর্ধনা এবং সম্মাননা দেয়া হল খুব সাম্প্রতিক সময়ে। সেখানে বরিশালের আর এক কৃতী সন্তান মহান সুরকার শহীদ আলতাফ মাহমুদ এবং আব্দুল লতিফ ছিলেন প্রধান আকর্ষণ।

আলতাফ মাহমুদ নেই, তাই লতিফ ভাইকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের শেষ ছিল না বরিশালবাসীর। এই অসুস্থ শরীরে তাঁকে যেতে হয়েছিল বরিশাল। এই যাওয়াই তাঁর অসুস্থতার সূত্রপাত এবং জীবনের শেষ সম্বর্ধনা। লতিফ ভাই কাকতালীয়ভাবে ভাগ্যবান, কেননা ভাষাসৈনিক হিসেবে তাঁর মৃত্যুটা ফেব্রুয়ারি মাসে, আর নিজ এলাকার লোকের শেষ ভালোবাসা বুকে নিয়েই তাঁর শেষ যাত্রা। একটি কথা বার বার উঁকি দিচ্ছে- তা হলো লতিফ ভাই 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের প্রথম সুরকার এবং গায়ক। প্রায় দুই বৎসরকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বহুবার তিনি তাঁর দরদী কণ্ঠে এই গান পরিবেশন করে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, মানুষকে সমব্যথী করে তুলেছেন। সে সময় সেই সুর এবং কণ্ঠ দেশের মানুষের ভালোবাসা কুড়িয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন আলতাফ মাহমুদ, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীকে বললেন, 'আমি আপনার এই গানটার সুর করছি।' গাফ্ফার চৌধুরী বললেন, 'সে ভালো কিন্তু লতিফ ভাই যদি আপত্তি না করেন তবে আমার কোন আপত্তি নেই'। আলতাফ মাহমুদ ছুটলেন লতিফ ভাইয়ের কাছে। আগমনের হেতু জানালেন এবং গানটি শোনালেন। লতিফ ভাই খুশী হলেন, 'বললেন এটা আমার চেয়ে ভালো হয়েছে এবং এই সুরেই এখন থেকে গাইতে থাকো'। এই ছোট্ট সম্মতির পেছনে যে কতবড় উদারতা আর কত মহৎপ্রাণের উদাহরণ তা সহজে অনুমান করা যায় না। আলতাফ মাহমুদ গানটির সুরে বহুবার পরিবর্ধন-পরিমার্জন করেছেন, বর্তমানে প্রচলিত সুরটা তার ৬ষ্ঠ পরিমার্জনের ফসল। দেশকে আর দেশের মানুষকে কতটুকু ভালোবাসলে নিজের এমন খ্যাতি তুচ্ছ জ্ঞান করা যায়? এমন উদাহরণ কি সহজে আর পাওয়া যাবে? মনে হয় না।

নদী বিধৌত বরিশাল রত্নগর্ভা। অনেক গুণী লোকের জন্ম এখানে। লতিফ ভাইয়েরও। তাঁর ক্রমবর্ধমান জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে বাল্যকালটা বাদ দেয়া যায় না। লতিফ ভাই ১৯২৭ সালে বরিশাল সদর থানার 'রায়পাশা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাই। লতিফ ভাই চতুর্থ। এখনও দুই ভাই বেঁচে আছেন তারা লতিফ ভাইয়ের বড়। পিতা আমিন উদ্দিন ও মাতা আজীবুন্নেছা, তাঁরাও জান্নাতবাসী। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো তিরিশের দশকের প্রথমদিকে কোন মুসলমান পরিবারের সন্তানের সঙ্গীত জগতের প্রবেশ ছিল খুবই কঠিন। আমার এক প্রশ্নের জবাবে লতিফ ভাই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'সুর যে কেমন করে আমাকে আচ্ছন্ন করে তার সঠিক বিবরণ দেয়া খুবই কঠিন।' ছেলেবেলা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছিলেন, যতটুকু মনে পড়ে, তিনি যে পাড়ায় বসবাস করতেন তার পাশেই ছিল বর্ধিষ্ণু সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের বসতি। স্কুলে যেতে এবং আসতে রাস্তার দু'পাশ থেকে নানা সুরের গান-বাজনা তাঁর কানে আসত। শুনেই মুখস্ত হয়ে যেত বেশিরভাগ। তারপর স্মৃতি থেকে নিজের মত সুর করে গাওয়া। বন্ধুরা শুনে মুগ্ধ হতো এবং গান শেখার জন্য উৎসাহিত করত। লতিফ ভাইদের পরিবারে গানের প্রচলন ছিল না এমন নয়, তবে তা ইসলামী গজল পর্যন্তই। একদিনের কথা বলতে গিয়ে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'স্কুলে থিয়েটার হচ্ছে সেখানে তাঁকে গান গাইতে হবে, থিয়েটার শুরুর আগে তাঁকে নিয়ে স্টেজে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল, পর্দা ওঠার সাথে সাথে দেখলেন তাঁর সামনে শুধু লোক আর লোক। তাঁর কেমন যেন ভয় হতে লাগল। সাহসে ভর করে গান শুরু করলেন কিন্তু তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন তাঁর হাত পা শীতল হয়ে আসছে, বুক কাঁপছে। তবু গান ধরল- 'হে খোদা দয়াময় রহমান রহীম'। বহু সাহস করে দু'বার গাইবার পরে সত্যি সত্যি আর গলা থেকে শব্দ বের হলো না, তারপর দৌড়ে স্টেজ থেকে পর্দার আড়ালে। ঠিক সেই সময় কে একজন হাত চেপে ধরল এবং 'বলল তোমাকে গান গাইতেই হবে। চল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি' তাকিয়ে দেখলাম স্কুলের হেড মাস্টার, তিনি আমাকে স্টেজে নিয়ে গেলেন এবং পুনরায় গান শুরু করতে হলো। যতক্ষণ গান শেষ না হলো উনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, উনার উপস্থিতি আমাকে সাহস জোগালো। গান শেষ হবার সাথে সাথে অগণিত হাত তালিতে স্কুল প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। আর কোথা থেকে যেন একরাশ সাহস আমার বুকে জমা হল। সেই সাহসই আজকের আব্দুল লতিফ। আমার আর এক প্রশ্নে জবাবে তিনি আমাকে বলেন, 'তাদের পাড়ার পরেই হিন্দুপল্লীতে প্রবেশ করলেই প্রথম বাড়ীটাই ছিল একজন নামকরা আইনজীবীর। তার নাম ছিল শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গ ভূষণ বসু। তিনি লতিফ ভাইয়ের গান শুনেছিলেন। এবং স্কুলে যাবার পথে সব সময়ই লতিফ ভাই গান গাইতে গাইতে পথ চলতেন, এটাও ভুজঙ্গ বাবু লক্ষ্য করতেন। এই ভুজঙ্গ বাবু তাঁকে একদিন কাছে ডেকে ভালো করে গান শেখার পরামর্শ দেন। আশ্বাস দিয়ে জানান, তার পরিচিত ভালো
গানের মাষ্টার আছে, যার কাছে তিনি তাকে নিয়ে যেতে পারেন। লতিফ ভাই সাথে সাথে রাজী হয়ে যান এবং তার কথামত গানের মাস্টারের কাছে পাঠ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর ভুজঙ্গ বাবু তাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়, তার বাড়ীতেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। ভুজঙ্গ বাবুর তেমন জাতপাত কিংবা ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই ছিল না। তার বাড়ীটা ছিল কলকাতা গোপাল মল্লিক লেনে, ঠিক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উল্টোদিকে। ভুজঙ্গ বাবু ঐ এলাকায় পণ্ডিত সুরেন দাসের কাছে লতিফ ভাইয়ের গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন। পণ্ডিত সুরেন দাস রাগ সঙ্গীতের একজন নামকরা শিল্পী ছিলেন। লতিফ ভাই এই রাগ সঙ্গীত পণ্ডিতের কাছে তিন বৎসর সঙ্গীতের তালিম গ্রহণ করেন। এই

সময়টা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়। সুরেন দাসের বাড়ির পাশেরই ছিল স্থানীয় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের অফিস। যেখানে একজন শিৰক গণসঙ্গীত শেখাতেন। লতিফ ভাই সময় করে ওখানে গিয়ে গণসঙ্গীত শিখতে আরম্ভ করেন। যে হিন্দু পরিবারে লতিফ ভাই থাকতেন, সেখানে জাতপাতের বালাই না থাকাতে অসাম্প্রদায়িক মনমানসিকতায় তিনি নিজেকের গড়ে নিয়েছিলেন। কিন্' কলকাতায় দাঙ্গার সময় তাদের পাড়ার সবাই মিলে পাহারা দিতেন। লতিফ ভাই কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'কলকাতায় জাপানী আক্রমণের সময় একটি নতুন বাহিনী তৈরী হয়, এই বাহিনীর সর্বময় কর্তা ছিলেন মোহাম্মদ শাহজাহান। যিনি বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন (কলকাতা মোহামেডান ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন)।

তিনি সিভিল এয়াররেইড কন্ট্রোল-এর সর্বময় কর্তা। তার কাছে গিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি নিয়ে চলে যান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই সময় তাকে অতি কষ্টে জীবন-যাপন করতে হয়। মাঝে মাঝে তিনি এই বাহিনীর তাঁবু সেলাইয়ের কাজও করেছেন। প্রায় এক বৎসরকাল চাকরি করার পরে বাহিনী যখন ভেঙ্গে দেয়া হল তখন কলকাতায় ফিরে এসে আবার সেই ভুজঙ্গ বাবুর পরিবারে আশ্রয়। বয়স তখন আমার কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা পড়েছে। নিজের ভালো-মন্দ বুঝবার সময় হয়েছে। ১৯৪৭-এর বিভীষিকাময় দিনগুলি কেমন যেন আমার মনে দানা বাঁধতে থাকে। অতি কষ্টে সেখানেও কেটে গেল এক বৎসরকাল। তারপর একদিন কাউকে কিছু না বলে ঢাকার পথে পা বাড়ালাম। বরিশাল গ্রামে গিয়ে থাকতে পারলাম না। বাবা তখন সরকারের চাকরি থেকে অবসর পেয়ে সংসার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। তাই চাকরির সন্ধানে চলে এলাম ঢাকায়। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায় উঠে তাদের কাছে একটি চাকরির জন্য সহায়ত চাইলেন। কথায় কথায় তারা জানলো, লতিফ ভাই ভালো গান গাইতে পারে। আর দেরী কেন, ঝটপট গানের আসরের ব্যবস্থা হয়ে গেল। গানের শ্রোতাদের ভেতরে একজন জানালেন, 'ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বড় একজন সঙ্গীত পরিচালক জনাব আব্দুল হালিম চৌধুরীকে তিনি জানেন। এবং পরের দিন সকালে এসে তিনি লতিফ ভাইকে নিয়ে ৪০/২, জিন্দাবাহার দ্বিতীয় গলিতে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের মেসবাড়িতে নিয়ে গেলেন, যেখানে হালিম চৌধুরীও বসবাস করতেন। তিনি লতিফ ভাইকে হালিম চৌধুরীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। লতিফ ভাই গান শোনালেন। হালিম সাহেব খুশী হয়ে জানালেন, সামনের শনিবার বিকেল তিনটায় নাজিমউদ্দিন রোডে অবস্থিত ঢাকা বেতারের অফিসে দেখা করার জন্য। তখনকার দিনে প্রতি শনিবার নতুন শিল্পী নির্বাচন করার জন্য অডিশন নেয়া হত। লতিফ ভাই যথারীতি দেখা করে অডিশন দিলেন এবং পাস করলেন। ৪ঠা আগস্ট, ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতার প্রথম লতিফ ভাইয়ের গান প্রচার করল। গানটি ছিল-

'সেথায় খুঁজিও মোরে
নিরবে যেথায় ঝরে আঁখিজল
শিশির ভেজানো ভোরে'

গানটি রচনা করেন মোদাচ্ছের আলী। সত্যিকার কথা বলতে কি তখনকার দিনে শিল্পীর সংখ্যা যেমন কম ছিল তেমনি গীতিকারের সংখ্যাও ছিল কম। গীতিকার মোদাচ্ছের আলী ঢাকাতে থাকায় জনাব চৌধুরী তাকে দিয়ে গান রচনা করে রেডিও অফিসে বসে সুর দিয়ে মেসে এসে সবাইকে সেই গানটি শেখাতেন। এমনও হয়েছে ঐদিনই রেকর্ডিংও করেছেন। লতিফ ভাই হাসতে হাসতে বললেন, তিনি রেডিওতে গান গাইবার আগে তার ছাত্ররা রেডিওতে গান গাইতে শুরম্ন করেছিল। লতিফ ভাই কোনদিন ধারণাও করেননি তিনি কোনদিন গান রচনা কিংবা তাতে সুর করতে পারবেন। মশকিল হলো একদিন এক ছাত্রীকে নতুন গান শেখাতে হবে। কোথায় পাবেন নতুন গান। প্রয়োজনের তাগিদে বের হয়ে এলো কিছু শব্দ-

'ততবার গেছ সরে
যতবার আমি চেয়েছি তোমায়
জড়াতে বাহুর ডোরে'।

গানটি নিয়ে ভয়ে ভয়ে হালিম চৌধুরীকে দেখালেন। হালিম সাহেব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নিজের কাছে রেখে দিলেন। এটাই ছিল লতিফ ভাইয়ের গীতিকার হওয়া। হালিম সাহেব সুর করলেন এবং কেউ কেউ জানলেও গোপনে 'আলেয়া' নামে প্রচার হতে থাকল। গীতিকার হিসেবে পরিচিতি পেলেও সুরকার হবার পেছনে হাসতে হাসতে তিনি আমায় জানালেন, তিনি তখনকার গীতিকার সত্যজিৎ মজুমদারের রচিত একটি গান সুরারোপ করে প্রথম শোনালেন হালিম ভাইকে। তিনি গানটি শুনে বলেছিলেন, লতিফ তুমি গায়কের চেয়ে গীতিকার কিংবা সুরকার হিসেবে বেশী সুনাম করতে পারবে ভবিষ্যতে। লতিফ ভাই হাসতে হাসতে বললেন, জহুরী রতন চেনে। বলতে বলতে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন, এটু থেমে বললেন, মেসের সিট ভাড়া এবং খাবারের টাকা অগ্রিম দিতে পারেননি কোন দিনও। প্রতিটা প্রোগ্রামে পেতেন মাত্র দশ টাকা। মাসে তিনটা প্রোগ্রাম। সুতরাং তিরিশ টাকায় চলা খুব কষ্টকর। এক সময় মেস থেকে তাকে বাদ দেয়া হয়।

সত্যি বলতে লজ্জা নেই লতিফ ভাই প্রায় আড়াই দিন কিছু না খেয়ে মেসে শুয়ে ছিলেন। আড়াই দিন পরে গ্রামের এক আত্মীয় তার সাথে দেখা করতে এলে তিনি লতিফ ভাইয়ের অবস্থা দেখে এবং শুনে সাথে করে নিয়ে যান জিন্দাবাহার লেনের বিখ্যাত 'মমতা রেস্টুরেন্টে'। পেটপুরে গোস্ত পরোটা খাওয়ানোর পর আত্মীয়টি তার হাতে দশটি টাকা পুরে দিয়েছিলেন। এই আড়াই দিন না খাওয়াটা মেসে জানাজানি হয়ে যায়। খবর পেয়ে হালিম ভাই আসলেন এবং লতিফ ভাইকে নিয়ে গেলেন নয়াবাজার এক হোটেলে নিজের ছোট ভাই হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন, নিয়মিত খাবার দিতে। হালিম ভাই তার সব খরচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাই তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে বলেছিলেন, 'হালিম ভাই না থাকলে তাকে গীতিকার বা সুরকার হওয়া হত না'। লতিফ ভাই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আমায় জানালেন, হালিম ভাই যখন জীবনের শেষ দিনে হাসপাতালে তখন হঠাৎ করে তার কাছে মুরগীর স্যুপ, নরম পোলাও চালের ভাত, পাবদা ও বাতাসী মাছের ঝোল খাবারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লতিফ ভাই শেষ দিনগুলোতে এক এক দিন এক এক রকম তরকারি রান্না করে নিয়ে যেতেন আর পাশে বসে হালিম ভাইকে তৃপ্তিসহকারে খাওয়াতেন। আর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতেন তার নিজের জীবনের দুর্দিনের কথা। সেই সময় হালিম ভাই সহযোগিতা না করলে আজকের আব্দুল লতিফের জন্মই হতো না।
১৯৭৪ সালে অবসর নিলাম বেতার থেকে। তারপর বঙ্গবন্ধু সংবাদ পাঠালেন। আমি ভাবলাম অশিক্ষিত মানুষ কি বলতে কি বলে ফেলি, তাই সংশয় ছিল। তবুও গেলাম। বেতার থেকে অবসর নেয়ায় জিজ্ঞাসা করলেন ' তোর বাপের কয়টা বেতার-টিভি সেট আছে? আমি ইতস্তত করে বললাম- আমার বাবার তো কোন বেতার সেট নেই। তখন বললেন- 'গান লেখস, গাস। চলে যা তথ্য ও গণযোগাযোগে। যারা শ্রমিক-কৃষক খেটে খায়। যাদের সেট নেই তাদের নিয়ে গান লিখে-গেয়ে আনন্দ দিবি'। তিনি আমাকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক নিযুক্ত করলেন। তাতে আমার গান লেখার বৈচিত্র্য বাড়লো। বিশেষ করে বিষয়ের। জনগণের নানান সামাজিক সমস্যা নির্বাচন, খেলাধুলা, হলকর্ষণ, শ্রমিকের গান, জনসংখ্যা, পরিবেশ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক গান রচনা ও সুর করেছি'।
আমার অন্য এক প্রশ্নের জবাবে লতিফ ভাই জানালেন, ঢাকা বেতারে তিনি কবি জসীমউদ্দীন রচিত ' বেদের মেয়ে' নাটকে 'গয়া বাইদা'র ভূমিকায় অভিনয় এবং গান করেছেন। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন। বাংলাদেশ টিভিতে গোড়া থেকেই তিনি বিভিন্ন রকম গান, গীতিনকশা রচনা করে প্রচার করার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, তিনি পিয়স সংলাপযুক্ত কোন নাটক লিখতে পারেননি এবং চেষ্টাও করেননি।
১৯৭৩ সালে আমি ইসলামাবাদে (পাকিস্তান) বন্দী জীবনযাপন করছিলাম স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ। বন্ধুদের পরামর্শে একদিন পালিয়ে পরিবারসহ আফগানিস্তান হয়ে কাবুল চলে যাই এবং সেখান থেকে দিল্লী-কোলকাতা হয়ে ঢাকা আসি। আমার চাকুরি মিনিস্ট্রি অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স হওয়ার কারণে আমি ঢাকা অফিসে এসে যোগদান করি। ঢাকাতে আমার এক বৎসরকাল বসবাসের সময় লতিফ ভাইয়ের বাসায় গিয়ে মাঝে মাঝে কিছুটা সময় কাটাতাম। লতিফ ভাইয়ের পরামর্শমত ঐ সময় আমরা দু'জন একুশের বিভিন্ন গানের স্বরলিপি করতাম। পরবর্তীতে ১৯৭৬
সালে লতিফ ভাইয়ের নিরলস পরিশ্রমে শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়। তাতে দেশের প্রখ্যাত শিল্পীরা ছিলেন- ফিরোজা বেগম, লায়লা আরজুমান্দবানু, ফেরদৌসী রহমান, রুন্না লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, কলিম শরাফী, শেখ লুৎফর রহমান, কাদেরী কিবরিয়া, সোহরাব হোসেন, সুধীন দাস, বেদার উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ ইয়াসিন খান, খালিদ হোসেন, ফকির আলমগীর, এম এ হামিদ, ফজলে নিযামী, খুরশীদ আলম, মাহমুদুন্নবী, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, মিলিয়া আলী, আঞ্জুমান আরা বেগম, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, খন্দকার ফারুখ আহমেদ, মোঃ রফিকুল আলম, সৈয়দ আব্দুল হাদি, ফৌজিয়া খানসহ আরো অনেকে। ঐ সংস্থা থেকেই 'একুশের স্বরলিপি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। মাত্র ০৭ টি গান দিয়ে একটি স্বরলিপিগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। গানগুলি- (১) আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, (২) আমার এ অগ্নি গোলকের মধ্যে, (৩) আমার প্রিয় বাংলা ভাষা, (৪) ও আমার এই বাঙলা ভাষা, (৫) কবিতায় আর কি লিখব (৬) রাষ্টভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালি (৭) আবার ফাগুন এসেছে। এই সাতটি গানের চার নম্বর গানটি লতিফ ভাইয়ের লেখা। গানটি আমি স্বরলিপি করে লতিফ ভাইকে দিয়েছিলাম। বাংলার রূপবৈচিত্র্য, ঋতুচক্র, মানব-মানবীর মনো দৈহিক সম্পর্ক নিয়ে যেমন অসংখ্য গান রচিত হয়েছে তেমনি একুশকে নিয়ে শত শত গান, কবিতা রচিত হয়েছে। বাঙলা ভাষার দাবী কেবল শহরভিত্তিক ছিল না। এটা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামে গঞ্জে। যার কারণে প্রত্যন্ত গ্রামের পেশাদার কবি বা শিল্পী-সুরকার নয় এমন মানুষও নিজের আন্তরিকতায় লিখে ফেলেছে অসাধারণ ভাষার গান। জন্মগত সুরেলা বাঙালির স্বভাবসুলভতায় সুরও করেছে। বলতে গেলে লতিফ বাই এদের মতই একজন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, 'যখন একুশের গানে সুরারোপ করি তখন আমি সুরকার নই। কেবল গাইতে পারি মাত্র। শুধু মনের টানে একুশের গানটির সুর করে ফেলি। এরও রয়েছে মজার ঘটনা। লতিফ ভাই বললেন, গানটি আমাকে দিয়েছিল ১৯৫৩ সালে ড. রফিকুল ইসলামের ছোট ভাই আতিকুল ইসলাম।

কবিতাটি একটি প্যামপেস্নটে প্রকাশ পেয়েছে। আমি দেখলাম, ভালো লাগল, সুর করলাম। গাইলাম, ঢাকা কলেজের ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে। ছাত্ররা মুগ্ধ হলো বার বার গাইতে হলো। এই গান গাওয়ার জন্য কয়েকজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কারও করা হলো। যদিও সে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হয়েছিল। কিন্' কথা হলো আমি কি তখন সুর করার উপযোগী ছিলাম। ছিলাম না। শুধু মনের টান আর দেশকে ভালোবাসার জোরে এসব পেরেছি। তার পর তো লিখলাম 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' এর মত বিশাল গান। সুর করে গাইলাম। জনগণ মনথেকে শুনল এবং বোধে আনল সে গানের ভাষা। এ রকম কত লোক পড়ে আছে বাংলার আনাচে কানাচে'। এ সব সরল উক্তিই প্রমাণ করে লতিফ ভাই কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন। ভালোই হোক আর মন্দই হোক এ দেশের গান এ দেশেরই সম্পদ, সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিছু গান ভালো লাগে কিছু গান ভালো লাগে না; কিন্' এমন কিছু গান আছে যা ইতিহাসে ভালো লাগা না লাগার উর্ধ্বে। আর যিনি দেশের গান লেখেন তিনি দেশের প্রতি কম মমত্ববোধ করেন না কখনোই। তাই এটাকে ছোট বড় ভাববার অবকাশ নেই। প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা বলতেই হয়- ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনের উদ্বোধনী ছিলো কার্জন হলে। সেখানে কোলকাতা থেকে এসেছিলেন মনোজ বসু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়সহ নামকরা বড় বড় লেখক-সাহিত্যকেরা। মনোজ বসু ঢাকা থেকে কোলকাতা ফিরে গিয়ে আমাকে বললেন, কাগমারী সম্মেলনে দুটো জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে, তা হলো একটি আব্দুল লতিফের 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গান আর অন্যটি আমানুল হকের ' আমার দেশ' শিরোনামের আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

লতিফ ভাই ব্যক্তিগত জীবনে অহংকারহীন একজন মানুষ ছিলেন। খুব সাদাসিধে জীবনে অভ্যস্ত বলেই তাঁর সাধারণ মানুষের সাথে প্রাণের টানটা গড়েছে মজবুতভাবে। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামে বিয়ে করেন। পাত্রী পটুয়া কামরম্নল হাসানের মামাতো বোন নাজমা রসুল। দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক। প্রথম পুত্র সিরাজুস সালেকীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে শিৰকতা পেশায় নিয়োজিত। স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সেখানে বসবাস করে। ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়। বড় মেয়ে সায়মা (মালা)র দুটি সন্তান। স্বামী অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। বর্তমানে ব্যবসায়ী। ছোট মেয়ে ঢাকা বিজ্ঞান কলেজে শিৰকতা করে এবং ছোট ছেলে আরিফ ডিগ্রী করেছে।

লতিফ ভাইয়ের জীবন সাধাসিধে হলেও বর্ণাঢ্য। সংৰেপে তার প্রধান অংশগুলো আমি পাঠকদের জন্য তুলে দিলাম। জন্ম ১৯২৭ সালে বরিশাল জেলার সদর থানার 'রায়পাশা' গ্রামে। ১৯৩৩ সালে প্রামিক বিদ্যালয়ে ভর্তি। লেখা পড়ার চাপে স্কুল পালানো ছিল তার স্বভাব। তাইপড়াশোনা বেশী দূর এগোয়নি। সুরেলা কুণ্ঠের সুবাদে স্কুল বন্ধুরা পিতা আইনব্যাবসায়ী ভুজঙ্গ ভূষণ বসুর সাথে পরিচয়। তার আনুকূল্যে স্থানীয় উস্তাদের কাছে সঙ্গীতে প্রাগতভাবে হাতেখড়ি। এই ভুজঙ্গ বসুই নিয়ে যান কলকাতায়। উচ্চতর প্রশিৰণের জন্য পন্ডিত সুরেন দাসের কাছে প্রেরণ করেন। সঠিক চর্চার সাথে শিৰা চলল তিন বৎসর। ১৯৪২ সালে এয়ার রেইড এ চাকরি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তার মনে ভীষণভাবে রেখাপাত করে। তখন কাউকে কিছু না বলে ঢাকা চলে আসেন। ঢাকা বেতারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ১৯৪৮ সালে। এর পর বাঙালির প্রাণের দাবী ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। স্বাধীনতার দাবীতে পাকিস্তান সরকারের দেয়া 'তমঘায়ে মজলিস' খেতাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৪ সালে বেতার থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে একই সময়ে তথ্য ও গণসংযোগ সেলে উপ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। ঐ বছরই ভারতে জনসংখ্যা বিষয়ক আন্তর্জঅতিক সেমিনারে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে চলচ্চিত্রের সম্মানজনক 'সিক্যুয়েন্স পুরস্কার-'৭৬ লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে একক অনুষ্ঠান 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাউড়া নিতে চায়' গান পরিবেশনে পুলিশের হস্তাৰেপ। ১৯৭৯ সালে মহান একুশে পদক লাভ। ১৯৮১ সালে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনা পান। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ এ্যাসট্রোলোজি পামেস্ট্রি এ্যাসোসিয়েশন কর্তক সংবর্ধনা পান এবং ঐ একই বছর ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে 'দিল রবার' শিরোনামে ১৬৯টি হামদ্, নাত ও গজল প্রকাশ। ১৯৮৫ সালে শের-এ-বাংলা জাতীয় স্মৃতি সংসদ কর্তৃক 'শের-ই-বাংলা স্মৃতি স্বর্ণপদক -'৮৫ লাভ। একই বছর ঢাকায় থিয়েটার সপ্তাহে সংবর্ধনা এবং সঙ্গীতে অনন্য অবদানের জন্য নাটোরে 'বাংলাদেশ যুব উৎসব-'৮৫ উপলৰে গুণীজন সংবর্ধনা লাভ, ২১ ফেব্রয়ারি 'ভাষার গান দেশের গান' গীতিগ্রন্থে ভাষা, দেশপ্রেম জাগরণীমূলক গান, স্বদেশী জারী প্রভৃতি ৯৬টি গান বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ সালে 'বাংলাদেশ লেখক কল্যাণ সংঘ' কর্তৃক সংবর্ধনা এবং 'বাংলাদেশ গীতিকবি সংসদ' কর্তৃক সংবর্ধনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। ১৯৮৮ সালে 'ইউনাইটেড নেশন এনভারমেন্ট প্রোগ্রাম' কর্তৃক প্রচারের জন্য সংবর্ধনা ও সনদলাভ। ১৯৮৯ সালে খুলনা 'নান্দিক'-এর দ্বারা গণসংবর্ধনা। ১৯৯১ সালে বুলবুল ললিতকালা একাডেমীর তিন যুগ পূর্তি গুণীজন সংবর্ধনা। একই বছর চর্তুথ জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎসবে শিল্পী শ্রদ্ধার্ঘ পান। ১৯৯২ সালের ২রা আগস্ট গণযোগাযোগ অধিদপ্তর থেকে অবসর গ্রহণ। একই বছর সরকারি ব্রজমোহান কলেজের শতবর্ষ-১৮৮৯ পূর্তি উৎসবে বরিশালে সংবর্ধনা। ১৯৯৩ সালে 'কুমিলস্না থিয়েটার'-এর একযুগ পূর্তিতে শিল্পীকে সংবর্ধনা। ১৯৯৪ সালে ' অনিন্দ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক

সংগঠনের শ্রদ্ধাঞ্জলি, ইউনেস্কো ক্লাব ঢাকা সিটির এ্যাওয়ার্ড-৯৪ গ্রহণ। এবং বরিশাল বিভাগ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের স্বর্ণপদক ৯৪ প্রদান। ১৯৯৫ সালে পলস্নীগীতিতে অসামান্য অবদানের জন্য 'তারকালোক পদক' লাভ এবং চট্টগ্রামে 'ত্রীতোরঙ্গ' কর্তৃক সপ্তাহব্যাপী লোক উৎসব উপলৰে সংবর্ধনা। এছাড়া 'আমরা সূর্যমুখী' তাকে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার প্রদানসহ অনেক সংগঠন কর্তৃক বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

আব্দুল লতিফের মত অসামান্য বিবেদিতপ্রাণ গুণী শিল্পী প্রতিদিন জন্মায় না। তিনি প্রতিভার বরপুত্র হয়েই জন্মেছিলেন। দেশের সংস্কৃতি আজ একজন অভিভাবক হারাল। তিনি নেই, কিন' তার আদর্শ এবং লৰ্য রেখে গেছেন আমাদের জন্য। লতিফ ভাইকে নিয়ে আমার এ লেখা খুবই সামান্য। আমি আশা করব তরম্নণ প্রজন্মের মেধাবী সন্তানরা লতিফ ভাইকে জানতে এবং বুঝতে প্রত্যয়ী হবে।